# সোহেল তাজের উদ্ভট আচরণ কেন

## আবুল হোসেন খোকন

সোহেল তাজ, মানে তানজিম আহমেদ সোহেল। এখন বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী। তিনি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদের ছেলে। স্বাভাবিক কারণেই সোহেল তাজ বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ সকলের কাছে অত্যন্ত স্নেহতুল্য এবং বিশেষ মর্যাদার আসনে রয়ে গেছেন। হয়তো সে কারণেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জুনিয়র হওয়া সত্ত্বেও তাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে সোহেল তাজ প্রায়ই উদ্ভট আচরণ করছেন। বিশেষ করে পিলখানার ঘটনার সময় যখন দেশে তোলপাড় অবস্থা, সরকার এবং সরকারের ক্ষমতা চ্যালেঞ্জের মুখে– তিনি তখন দিব্বি বিদেশে অবস্থান করেছেন। একটিবারের জন্য দেশে ফিরে শক্ত অবস্থানে অংশ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। এমনকি যখন ক'সপ্তাহ বা ক'মাস ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং উত্তেজনাকর অবস্থা– তখন পর্যন্তও তিনি দেশে আসেননি। তিনি এসেছেন প্রধানমন্ত্রী যখন সবকিছু চমৎকারভাবে সামাল দিয়ে ফেলেছেন তখন। যাইহোক, আমরা লক্ষ্য করছিলাম অনেক ক্ষেত্রেই তিনি মূল মন্ত্রী অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ডিঙ্গিয়ে কথা বলছেন। হতে পারে মূল মন্ত্রীই হয়তো তাকে মুখপাত্র হিসেবে কথা বলতে দিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল সোহেল তাজ পদত্যাগপত্র দিয়ে বসলেন, তিনি সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলেন, এ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে হইচই হলো, সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হলো। শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তিনি পদত্যাগ করলেন না। বললেন, তিনি মোটেও পদত্যাগপত্র দেননি, ছুটি নিয়েছিলেন। এখানে তার উদ্ভট আচরণটা কোন রকমে মাছঢাকা পড়লো। কিন্তু হঠাৎ তিনি গত ৭ জুন ২০০৯-এ যে কথাগুলো বলে দিলেন, তাতে হতবাক না হয়ে যে কারও উপায় নেই। শুধু হতবাক নয়, গোটা সরকারকে থুতু দেবার অবস্থা করে দিয়েছেন সোহেল তাজ।

ওইদিন সোহেল তাজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বৈঠক শেষে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, 'এই পাঁচ মাসে র‍্যাবের ক্রসফায়ারে কোন মানুষ হত্যার ঘটনা ঘটেনি। এই সরকারের আমলে কোন ক্রসফায়ার হচ্ছে না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আত্মরক্ষার স্বার্থে নিয়ম অনুযায়ী যা করার তাই করছে।' অথচ বাস্তব হলো দেশে বে-পরোয়া ক্রসফায়ার ঘটে চলেছে এবং সারাদেশ বাদ দিলেও গত একমাসেই শুধু রাজধানী ঢাকাতেই ক্রসফায়ারে ১০ জনকে হত্যা করার ঘটনা ঘটেছে। প্রশ্ন হলো প্রতিমন্ত্রী এভাবে কেন মিথ্যাচার করলেন? শুধু তাই-ই নয়, তিনি আরও যা বলেছেন, তাতে ধিক্কার জানানোর ভাষাও হারিয়ে ফেলতে হয়। তিনি উদাহরণ টেনে বলেছেন, 'বিভিন্ন দেশে পুলিশের গুলিতে শত শত মানুষ মারা যায়, যুক্তরাষ্ট্রেও প্রতিবছর ৬শ' থেকে ৭শ' মানুষ মারা যায়। এসব ঘটনা আইন বা বিচারবহির্ভূত ঘটনা নয়।' নিশ্চয়ই তানজিমের এসব কথা শুনে র‍্যাবের ঘাতকরা উলাশে উলম্ফন করছেন এবং দেশে তারা ক্রসফায়ারের নহর বইয়ে দেয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবেন। কী করে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিমন্ত্রী হয়ে এরকম ন্যাক্কারজনক কথা বলতে পারলেন সোহেল তাজ?

এই র‍্যাবই গত ২৭ মে ২০০৯ কথিত ক্রসফায়ারে ২ জন মেধাবী কলেজ ছাত্রকে হত্যা করেছে। এই দুই ছাত্রই সরকার দলীয় ছাত্রলীগের সংগঠক। এরা হলো, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের তড়িৎ কৌশল বিভাগের চতুর্থবর্ষের ছাত্র মহসীন শেখ (২৩) ও যন্ত্রকৌশল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (২২)। এদের হোস্টেল ক্যাম্পাস থেকে তুলে নিয়ে এসে রাত সাড়ে ১২ টার দিকে মানিকমিয়া

এভিনিউতে কোন কারণ ছাড়াই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। খবরের কাগজগুলো বলেছে, হ্যান্ডকাপ পড়ানো অবস্থায়ই তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়। যদিও র‌্যাব দাবি করেছে, এরা দুইজন মানিকমিয়া এভিনিউ দিয়ে সন্দেহজনকভাবে যাচ্ছিল, এ সময় চ্যালেঞ্জ করলে র‌্যাবের প্রতি তারা গুলি চালায়। তখন র‌্যাবও পাল্টা গুলি চালালে দুইজনই নিহত হয়। র‌্যাবের এই গল্প সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। র‌্যাব আরও বলেছে, নিহতরা চিহ্নিত সন্ত্রাসী। অথচ ওই মেধাবী ছাত্র দু'জন মোটেও সন্ত্রাসী বা কোন অপরাধী নয়। তাদের বিরুদ্ধে থানা-পুলিশ-কলেজ কর্তৃপক্ষসহ কারও কোন অভিযোগ নেই। সে ধরণের কোন রেকর্ডও নেই। মেধাবী এবং একনিষ্ঠ ছাত্র হিসেবেই তারা পরিচিত ছিল। খবরের কাগজগুলোর তথ্য অনুযায়ী, প্রতিপক্ষ গ্রুপ ও স্থানীয় এক সাবেক ওয়ার্ড কমিশনারের কারসাজিতে র‌্যাব এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। অর্থাৎ র‌্যাব সুযোগের সৎ-ব্যবহার করেছে, জল ঘোলা অবস্থায় মাছ শিকার করেছে। কথা হলো, এই র‌্যাব দেশের আইন-আদালতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এভাবেই একের পর এক মানুষ হত্যা করছে, ভাল মানুষকে সন্ত্রাসী বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে মিথ্যা গল্পের ফানুশ উড়িয়ে দিব্বি পার পেয়ে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বর্তমান সরকারের সকল হুঁশিযারি, সতর্কবাণীকেও তারা কেয়ার করছে না। এরা নিজেদেরকে বারবার সর্বেসর্বা মনে করছে। এতে কেন সায় যোগালেন সোহেল তাজ?

কালোকে পছন্দ কার? নিশ্চয়ই কোন সাদামন কখনও কালোকে পছন্দ করবে না। কুৎসিত কালোই করবে কালোকে পছন্দ। এই পছন্দ করেই না র‌্যাব নামের একটা সংস্থা গঠন করা হয়েছে, এবং র‌্যাবের পোশাক করা হয়েছে কুৎসিত কালো। শুধু পোশাকে কালো হলে কথা ছিল না, এদের তাবৎ কর্মই কালো। এরা আইনরক্ষা বাহিনী– অথচ এরা কোন আইন মানে না, বিচার-আদালত মানে না। এরা শুধু মানুষ হত্যা করে মিথ্যা গল্প বানিয়ে। কোন সৎ বা সাদা কিছু নেই বলেই না কালো পথের এই কারবার। কোন সভ্যতা কি কালোকে পছন্দ করে? করে না। সুতরাং অবস্থা দৃষ্টে বলা যায়, যারা র‌্যাবের শরীরে কালো কুৎসিত পোশাক চাপিয়ে এদের গোটা চরিত্রটাকেই কালো বানিয়ে ফেলেছে– তারা আর যাইহোক আলোর দিশারী নয়। এই তারা হলো যুদ্ধাপরাধী জামায়াতে ইসলামী, আর তাদের দোসর সামরিক জান্তার সৃষ্ট বিএনপি। এরাই স্রষ্টা র‌্যাবের।

কথায় আছে কয়লা ধুলে কালো দূর হয় না। কালো কালোই থেকে যায়। অর্থাৎ যা কলুষ তা কলুষই থেকে যায়। কলুষ কখনও কলুষমুক্তি দিতে পারে না। আমাদের দেশের আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা র‌্যাবের ব্যাপারও তাই-ই। এরা আইনবহির্ভূত কর্মে এতোটাই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে হাজার ধুলেও এদের ময়লা দূর হবে না। তার প্রমাণ কিন্তু বর্তমান সরকারের এ কয় মাসেও মিলে আসছে। এদের মানুষ হত্যার নেশা কাটানো যায়নি, আইনকে পদদলিত করার মোহ দূর করা যায়নি, আর বিচার-আদালতকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানোর খায়েশও কাটানো যায়নি। সুতরাং প্রশ্ন উঠতেই পারে, এদের কেন গড়া হয়েছে? আসলে এরা কারা, বা এদের পরিচালকরা কোন্ এজেন্ডায় কাজ করছে?

মনে হয় প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার আগে এদের জন্মকালটা দেখা যেতে পারে। আর এটা দেখলে অনেক উত্তর এমনিতেই বেরিয়ে আসতে পারে। আমরা যদি ২০০৪ সালের ২৮ নভেম্বর দেওয়া হাইকোর্টের একটি রুলনিশি দেখি– তাহলেই পরিস্কার হতে পারি। ওইদিন এই মর্মে হাইকোর্ট থেকে সরকারর প্রতি রুলনিশি জারি করেছিল যে, র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) কে 'কেন আইনানুগ প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেয়া হবে না?' আইন সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও পুলিশের অতিরিক্ত আইজিকে (র‌্যাব) চার সপ্তাহের মধ্যে এই রুলনিশির জবাব দিতে বলা হয়েছিল। তার আগে ২০০৪ সালের ২৫ অক্টোবর র‌্যাব গঠনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীমকোর্টের দুই আইনজীবী যথাক্রমে

রিয়াজুর রহমান চৌধুরী ও শেখ গোলাম হাফিজ রীট মামলা দায়ের করলে আদালত আদেশ প্রদান করেছিল। শুনানীতে অ্যাডভোকেট রাজিউর রহমান চৌধুরী বলেছিলেন, দি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অধ্যাদেশ ১৯৭৯ সংশোধন করে ২০০৩ সালের ১২ জুলাই দি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়। এই সংশোধনী আইনের অধীনে গঠন করা হয় র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। কিন্তু অধ্যাদেশটি সংসদে অনুমোদিত হয়নি। কোন অধ্যাদেশ সংসদে অনুমোদনের পর জনগণের অবগতির জন্য তাকে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করতে হয়। কোন অধ্যাদেশ সংসদে অনুমোদিত না হলে এর কোন কার্যকারিতা থাকে না। যে আইনের অধীনে র‌্যাব গঠন করা হয়েছে সেই 'দি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (অ্যামেন্ডমেন্ট)' আইনটি সংবিধান পরিপন্থী। 'ক্রসফায়ার'-এর নামে র‌্যাবের হেফাজতে যেসব মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে এতে করে ক্রসফায়ারে মৃতদের সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত আইনের আশ্রয় লাভের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ ছাড়া র‌্যাব গঠনের ফলে দুটি প্যারালাল বাহিনী গঠন এবং এর একটি আইন অনুযায়ী ও অপরটি সরকারের নির্দেশে পরিচালনা করা বৈষম্যমূলক ও সংবিধান পরিপন্থী। র‌্যাব গঠনের মাধ্যমে সরকার বেআইনি মিলিশিয়া গঠন করেছে। এ ছাড়া সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী র‌্যাবকে সাধারণ পুলিশের পাশাপাশি একই রকমের কিছু দায়িত্ব দিয়ে একটি প্যারালাল বাহিনী গঠন করা হয়েছে, যা অবৈধ। এভাবে ক্রসফায়ারের নামে র‌্যাব এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং করছে। বেশ কিছু সংখ্যক মানুষকে ক্রসফায়ারের মাধ্যমে হত্যা করে লঙ্ঘন করা হয়েছে সংবিধান ও মানবাধিকার।...র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নে সেনা সদস্যরা ডেপুটেশনে এসেছে। তারা এখানে এসে কোন অপরাধ করলে তার বিচার করার এখতিয়ার সরকারের নেই। ডেপুটেশনে এসে তারা মানুষ মারছে। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়ার এখতিয়ার সরকারের নেই। তাই র‌্যাবের কার্যক্রম বিচার ব্যবস্থা ও দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হুমকি স্বরূপ। এ ছাড়া র‌্যাব গঠন সংবিধানের ২৭, ৩১ ও ৩৫ অনুচ্ছেদ এবং মূলস্তম্ভ পরিপন্থী। সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদের অধীনে আইনটি বৈধতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে। [ সূত্র : জাতীয় দৈনিক সমূহ, ২৯ নভেম্বর ২০০৪]

এখানে বলে রাখা ভাল যে, ২০০৪ সালের ২৮ নভেম্বর দেওয়া হাইকোর্টের এই রুলনিশির ফল কি হয়েছে– তা দেশবাসী আজও জানেননা। ওটার সমাধান হয়ে গেছে, না এখনও লালফিতায় বন্দি হয়ে আছে– তা অজানা। যাইহোক, এই র‌্যাব সম্পর্কে মানুষের ধারণা বা অভিজ্ঞতা পরিস্কার। জন্মের পর থেকে র‌্যাব ক্রসফায়ার নামের একই গল্প ফেঁদে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করার মহোৎসব চালিয়ে আসছে। তবে হ্যাঁ, এই মহোৎসবে কিছু সাধারণ মানুষ যে বেশ খুঁশী থেকেছেন– তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ ত্যক্ত-বিরক্ত-অতিষ্ট মানুষ যখন দেখেছেন তাদের ওপর সন্ত্রাস চালানো-অত্যাচার-নির্যাতন চালানোদের বিরুদ্ধে কেও কোন ব্যবস্থা নেয়নি, তখন র‌্যাব তাদের ক্রসফায়ার করে হত্যা করেছে– তখন তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আর এই সন্তুষ্টির বিষয়টিকে অবলম্বন করে র‌্যাব অন্য এজেন্ডামতো এগিয়েছে। চেষ্টা করেছে মানুষের ওই সন্তুষ্টির তলায় তাদের অন্য এজেন্ডা বা আইনবহির্ভূত কিলিং চাপা দিয়ে চলতে। এখানে আরেকটি কথা উলেখযোগ্য তা হলো– তাদের এজেন্ডা বা কিলিংমিশনের টার্গেট কিন্তু কখনই রাষ্ট্রের প্রধান শত্রু যুদ্ধাপরাধীরা ছিল না। টার্গেট ছিল না জামাত-শিবির-মৌলবাদীরা। বরং টার্গেট ছিল উল্টো। তবে এক পর্যায়ে এই জায়গাটা পরিস্কার হয়ে উঠতে থাকায় কৌশল যে পরিবর্তন করা হয়নি– তা নয়। এজন্য মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার নতুন কৌশল নেওয়া হয়েছে। যেমন 'ক্রসফায়ার' আর 'ক্রসফায়ারের গল্প' প্রচার করতে করতে র‌্যাব সম্পর্কে মানুষের অবিশ্বাস এবং ধিক্কার এতোই পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছিল যে, এর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা জন্মানোর জন্য কিছু উদ্যোগ নেওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এই উদ্যোগের মর্মকথা ছিল, র‌্যাবকে একটা পর্যায়ে জঙ্গি মৌলবাদীদের গ্রেফতার (মোটেই ক্রসফায়ারে হত্যা নয়) এবং অস্ত্র-বিস্ফোরক উদ্ধারে নামিয়ে, সাফল্য দেখিয়ে ভাবমূর্তি গড়ে তোলা যায় কিনা– সেটা দেখা। কেননা সেই বিএনপি-জামায়াত জোট জামানায় সারাদেশে সিরিজবোমা

বিস্ফোরণ, বোমাহামলার মাধ্যমে লাগাতার হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। তখন বোমাতঙ্কের স্বর্গরাষ্ট্র হয়েছিল বাংলাদেশ। এই 'অবস্থার মোকাবেলা' দেখাতে র‌্যাবের কালো হয়ে যাওয়া ভাবকে 'উজ্জ্বল সাদায়' মূর্ত করে তোলার একটা কৌশল নেয়া হয়েছিল। সে অনুযায়ী তারা মৌলবাদী (?) জঙ্গি দমন-গ্রেফতার-গোলাবারুদ উদ্ধার তৎপরতা চালিয়েছে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে কয়লা ধুলে তো ময়লা যায়না। এখানেও এরা রূপকথার গল্প বানিয়ে মানুষকে প্রতাড়িত এবং বিভ্রান্ত করা হয়েছে।

র‌্যাবের এই বেআইনি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যে অতীতের ধারাবাহিকতা নেই– তা নয়। আসলে অতীতের নীলনকশার অংশ হিসেবেই বর্তমানের র‌্যাব গঠন করা হয়েছে। এটা যে সুদূরপ্রসারী অসৎ রাজনৈতিক চিন্তা থেকে পরিচালিত– তা বলারই অপেক্ষা রাখেনা। কেননা যারা এর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন, তাদের উত্থান ও ইতিহাসই সেটা পরিস্কার করে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে যাতে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশিত দর্শন প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে, বাংলাদেশ যাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শে যেতে না পারে এবং বাংলাদেশ যাতে কখনই গণতন্ত্র-মানবতাবোধ-প্রগতিশীলতা-শোষণমুক্তির ভিত্তি রচনা করতে না পারে– সেজন্য স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকেই বৈপরীত শক্তি তৎপরতা চালিয়ে আসছে।

বাংলাদেশে যারা সাংবিধানিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করেন তারা জানেন, মানুষের মুক্তিকামী রাজনীতির ভিত্তি কীভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে এবং তার বিপরীতে কীভাবে শঠরাজনীতির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত ৩৮ বছরে জনস্বার্থের রাজনীতি কতো বছর কীভাবে দেশ বা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পেরেছে, সেটা দেখার মধ্যেই অনেক প্রশ্নের জবাব রয়েছে। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাতিরজনক এবং দেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানকে স্বপরিবারে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, তারপর ৩ নভেম্বর নৃশংসভাবে জেলখানার মধ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে জাতীয় চার নেতাকে। এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে দুইজন সেনা কর্মকর্তার নেতৃত্বে সামরিক শাসন পরিচালনা করার ঘটনাও একই সূত্রে গাঁথা রয়েছে। এই শাসন পরিচালনার টার্গেট আর কিছুই ছিল না, টার্গেট ছিল জনস্বার্থের রাজনীতিকে খতম করা। এই রাজনীতিকে হত্যা করা বা একে ক্ষত-বিক্ষত করাই ছিল যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূলে। জনস্বার্থের রাজনীতিকে হত্যা করতে পারলে বা সেই রাজনীতিকে দূর্বল করতে পারলে– কাদের স্বার্থ উদ্ধার হয়, কারা কর্তৃত্বের জায়গায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে– সেটা না বোঝার কিছু নেই।

আজ যে র‌্যাব– তা সামরিক শাসনামলের অধ্যাদেশ-এর ধারাবাহিকতায় এসেছে। সামরিক শাসন যে এজেন্ডার উপর কাজ করেছিল, সেই এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্যই জেনারেল জিয়াদের গণবিরোধী রাজ নৈতিক শক্তি সংবিধান পরিপন্থীভাবে বেআইনি মিলিশিয়া বা র‌্যাব বানিয়েছে। সামরিক শাসনের সময় যেভাবে দেশপ্রেমিক মানুষ হত্যা এবং গণতান্ত্রিক শক্তিকে দমন বা নাশ করবার জন্য কাজ হয়েছে, এখনও সেটাই হচ্ছে। বিগত চারদলীয় জোট সরকার ও আর্মি ব্যাক্ড তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে যতো রাজনৈতিক হত্যা এবং দমন-পীড়ন হয়েছে, তা সেই এজেন্ডার উপর ভিত্তি করেই হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই মিলিশিয়া বাহিনীর হাতে আজ পর্যন্ত দেশের কোন শত্রু মরেনি। বরং এসব শত্রুরা কেবল বেড়েই উঠেছে। কোন রাজাকার মরেনি, কোন আলবদর মরেনি, কোন জামায়াত-শিবির মরেনি, কোন মৌলবাদী জঙ্গিও মরেনি। এমনকি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোন গডফাদারও মরেনি। মরেছে গডফাদারদের জন্য সমস্যা তৈরিকারী চুনোপুটি কিছু সন্ত্রাসী। সুতরাং পরিস্কার যে, বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই বেআইনি মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হয় এবং সুপরিকল্পিতভাবে তাদের দিয়ে বেআইনি কাজগুলো করানো হয়ে আসছে।

সুতরাং শেষ কথা হলো– তানজিমের হঠাৎ এই র‌্যাবের প্রতি এতো প্রীতি জন্মালো কেন? যারা অবিরাম গল্প বানিয়ে ক্রসফায়ারে মানুষ হত্যা করছে, আইন-আদালতকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে– তাদের প্রতি কেন দরদ? তাহলে কোন কারণে কি তানজিম ভীত? বিশেষ করে বাবার মতো অপঘাতে মরার ভয়

করছেন? আর করছেন বলেই দায়-দায়িত্ব থেকে– চাই কি দেশ থেকেও দূরে থাকতে চাচ্ছেন? মনে করছেন তাহলেই রক্ষা পেয়ে যাবেন? এর জবাব কি হবে– তা হয়তো সময়ই বলে দেবে। তবে সোহেল তাজ যা করেছেন, যা বলেছেন– তা একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত, নিন্দনীয়। তার উদ্ভট আচরণ শুভযাত্রায় অনেক ক্ষতিই করেছে। এটা তাকে নিজেও ভালভাবে ভেবে দেখতে হবে।

[১২ জুন ২০০৯ ঢাকা, বাংলাদেশ]

- **আবুল হোসেন খোকন** : সাংবাদিক, লেখক ও কলামিস্ট।